বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর বদলায়; কেন বদলায় জেনে নিন

ভোকাল কর্ডের মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয় একথা সবার জানা। ভোকাল কর্ড থাকে ল্যারিংস তথা স্বরযন্ত্রে এটাও নতুন তথ্য নয়। এটি শ্বসনতন্ত্রের এমন একটি অংশ যা গলা থেকে ফুসফুসে বাতাস যেতে দেয়। বাতাস যখন ফুসফুস থেকে স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়, তখন এটি ভোকাল কর্ডগুলোকে কম্পিত করে। আর এতেই শব্দ তৈরি হয়।

ভোকাল কর্ড তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত: ভোকালিস পেশি, ভোকাল লিগামেন্ট ও এগুলোকে আবৃত করে রাখা একটি শ্লেষ্মা ঝিল্লি (মিউকাস মেমব্রেন্স)। এটি পৃষ্ঠকে আর্দ্র রাখে ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। তবে আমাদের আলোচনা মূলত ভোকাল কর্ডের স্বাস্থ্য নিয়ে নয়। একবার ভেবে দেখুন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কণ্ঠেরও পরিবর্তন ঘটে। বিষয়টি তো খুব স্বাভাবিক তাই না? কিন্তু এর কারণটি জানার কি ইচ্ছে হয়নি? চলুন জেনে নেই:

বয়ঃসন্ধিকালের আগে নারী ও পুরুষের কণ্ঠস্বরে পার্থক্য খুব বেশি দেখা যায় না। তাই শিশুদের কণ্ঠ শুনে নারী ও পুরুষ আলাদা করা অনেক সময় কঠিন। সেটা কলকাকলি ও কলতান হিসেবেই আমরা কানে শুনে মনে ধারণ করি। মূল পরিবর্তন চোখে পড়ে বয়ঃসন্ধির সময় (মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮–১৩ বছর, ছেলেদের ৯–১৪) যখন হরমোন তাদের প্রভাব প্রয়োগ করতে শুরু করে। এতে স্বরযন্ত্রের গঠনে পরিবর্তন আসে। এ সময় পুরুষের অ্যাডামস অ্যাপল আরও বেশি প্রত্যক্ষ হয় এবং ভোকাল কর্ডের দৈর্ঘ্য বাড়ে। বয়ঃসন্ধির পরে পুরুষের ভোকাল কর্ডের দৈর্ঘ্য হয় সাধারণত ১৬ মিলিমিটার আর নারীর হয় ১০ মিলিমিটার। বয়ঃসন্ধির পর নারীর ভোকাল কর্ড ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সরু হয়। এই ছোট ও সরু ভোকাল কর্ডই পুরুষের তুলনায় নারীর স্বর সাধারণভাবে উচ্চ হওয়ার কারণ।

বয়ঃসন্ধির পরও হরমোন কণ্ঠস্বরকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ এখানেই সবকিছু শেষ নয়। একজন নারীর কণ্ঠস্বর তার ঋতুচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। অভিউলেটরি তথা ডিম্বাস্ফীতির পর্যায়ে কণ্ঠস্বর সবচেয়ে সুন্দর শোনায়। কারণ এই পর্বে গ্রন্থিগুলো সর্বাধিক শ্লেষ্মা (মিউকাস) তৈরি করে, যা ভোকাল কর্ডগুলোকে তাদের সর্বোত্তম কার্যকরী ক্ষমতা প্রদান

করে। একটি নির্ভরযোগ্য গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভনিরোধক পিল গ্রহণকারী নারীদের কণ্ঠে কম বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। কারণ পিলটি ডিম্বস্ফোটন বন্ধ করে দেয়।

পিরিয়ডের আগে হরমোনের পরিবর্তন কণ্ঠনালীকে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের শক্ত করে তোলে। অপেরা শিল্পীদের দিয়েই এর উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৬০-এর দশকে পিরিয়ডের আগে নারীদের ‘গ্রেস ডে’ দেওয়া হতো, যাতে তাদের ভোকাল কর্ড অক্ষত থাকে। এবং যেহেতু নারীদের ভোকাল কর্ড সরু, তাই অতিরিক্ত ব্যবহারে তাদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও বেশি হতে পারে।

শরীরের প্রায় প্রতিটি অংশের মতো, ভোকাল কর্ডেরও বয়স বাড়ে। এটি একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বরযন্ত্রটি তরুণাস্থির (কাটিলিজ) চেয়ে শক্ত, অনেকটা হাড়ের মতো হয়ে যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ৩০ বছরের পর ঘটতে শুরু করে। এটি ভোকাল কর্ডগুলোকে কম নমনীয় করে তোলে। এও মনে রাখতে হবে যে পেশিসমূহ ভোকাল কর্ড নড়াচড়া করতে দেয়, সেগুলোও আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হতে শুরু করে। ভোকাল কর্ডগুলোকে সচল রাখা লিগামেন্ট এবং টিস্যুগুলোও কম নমনীয় হয়ে ওঠে। কণ্ঠও ভারী হয়ে যায়। এছাড়াও ফুসফুসের পেশির কার্যকারিতা হ্রাস পায় — শব্দ তৈরি করতে ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের শক্তি কমায়। স্বরযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হ্রাসের পাশাপাশি প্রতিরক্ষামূলক শ্লেষ্মা উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলোর সংখ্যাও কমে যায়। যদিও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোকাল কর্ডের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে জীবনধারণের ধরনের কারণেও ভোকাল কর্ডের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

এতে ব্যক্তির কণ্ঠস্বরও পরিবর্তন হতে পারে। যেমনটা গায়কদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাদের জীবনের একটি ধরন আছে। এই ধরন অনুসারে তারা রেওয়াজ করে এবং নিজের কণ্ঠের যত্ন নেয়। আবার অনেক সময় ব্যক্তির নিজের গাফিলতিতে কণ্ঠের বারোটা বেজে যায়। এমন উদাহরণ গায়কদের জীবন থেকেই নেয়া যাবে। যেমন ধূমপান শ্লেষ্মা উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তবে এর আরেকটা ঝুঁকি হলো ধূমপান মিউকোসাল পৃষ্ঠগুলোকে শুকিয়েও দিতে পারে। মদ্যপানের ফলেও অনুরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কারণগুলো ভোকাল কর্ডের ক্ষতি করতে পারে এবং কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আনতে পারে।

ধরুন আপনি ধূমপানের মতো বাজে অভ্যাসে নেই। কিন্তু আপনার রোগ

হয়েছে। তখন চিকিৎসকের প্রেসক্রাইব করা কিছু ওষুধও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করাতে পারে। যেমন ল্যারিঞ্জাইটিসের জন্য ব্যবহৃত করা স্টেরয়েড ইনহেলার। ‘ব্লাড থিনার’ ও ভোকাল কর্ডের ক্ষতি করতে পারে। এতে কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। আবার ‘মাসল রিলেক্সেন্ট’ পেটের অ্যাসিডকে স্বরযন্ত্রে ফিরিয়ে দেয়। এতেও ভোকাল কর্ডের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ব্যবহার করা ছেড়ে দিলে সাধারণত ওষুধ থেকে হওয়া ক্ষতিগুলো চলে যায়। অর্থাৎ এই সমস্যা সাময়িক। বলা যাইয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

ভোকাল কর্ডের ক্ষতির আরও একটি কারণ হতে পারে অতিরিক্ত ব্যবহার। সাধারণত গায়ক কিংবা এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি ক্ষতি দেখা যায় — যারা কাজের সময় তাদের কণ্ঠস্বর অনেক বেশি ব্যবহার করেন। এ তালিকায় আরও আছেন শিক্ষক কিংবা ফিটনেস প্রশিক্ষক। তবে নিয়মিত গলার ব্যায়াম, গলাকে বিশ্রাম দেয়া, পর্যাপ্ত পানি পান করাসহ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি। স্পিচ থেরাপিও অনেক সময় কাজে আসে। আপনার ভোকাল কর্ডের যত্ন আপনাকেই নিতে হবে। বয়সের বিষয়টি তো আছেই। কিন্তু বয়স বাড়লেও অনেক সময় কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা ধরে রাখা যায় তার প্রমাণও গায়করাই দেন। একটি সুষ্ঠ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। শুধু ফিটনেস নয়, সার্বিক সুস্থতার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও ফেলনা নয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মচমচে রাখার টিপস

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এমন একটি স্ন্যাক যা বাড়িতেই সহজে বানিয়ে নেওয়া যায়। পদ্ধতিটা তো সহজই। কিন্তু সমস্যা হলো মচমচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, ফুড কর্ণারে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের স্বাদের পার্থক্য গড়ে দেয় সস আর মচমচে ভাব। এক্ষেত্রে বাড়িতে অনেকেই হতাশ হন। তবে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। কিছু টিপস অনুসরণ করলে সহজেই

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করা যাবে মচমচে।

সঠিক আলু বাছাই
আমরা সচরাচর আলুর জাত বা ধরন সম্পর্কে এত সচেতন নই। যদিও দেশি আলু আর কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে আলুকে চিহ্নিত করতে পারি। তবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য এমন আলু বাছাই করা জরুরি যাতে স্টার্চ কম। প্রতিনিয়ত ব্যবহারে বুঝতেই পারি। স্টার্চ অনেক সময় ঝরিয়েও নেওয়া যায়। তবে কাজটা অনেক সময় নেয়। তাই এমন আলু খুঁজুন যাতে স্টার্চ কম।

স্টার্চ সরানোর কায়দা
আলু লম্বা লম্বা করে কেটে নিন। আলু কাটার জন্য কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। আজকাল ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার হিসেবে একটা গ্যাজেটও পাওয়া যায়। সেটা হলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হবে সমান। সমান আকারের করা জরুরি। অনেকেই বিষয়টি এড়িয়ে যান। স্টার্চ সরাতে অবশ্যই ঠান্ডা পানিতে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখবেন। তাহলেই স্টার্চ পানিতে মিশে যাবে। তারপর আলু পানি থেকে তুলে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি ভালো তোয়ালেতে পানি সরানোর সুবিধা আছে।

পানি ঝরিয়েই ভাজতে নেই
পানি থেকে তুলে সরাসরি তেলে ভাজতে নেই। কারণ আলু থেকে পানি দ্রুত সরে না। ফ্রিজে কিছুক্ষণ রেখে বা ভাপিয়ে নিতে পারলে আলুর স্টার্চ আরেকটু কমবে।

প্রথমে ভাজুন মাঝারি আঁচে
ভালো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অর্থাৎ মুচমুচে করতে হলে দুই দফায় ভাজা দরকার। প্রথম দফায় মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে নিন। তারপর ডুবো-তেলে ভেজে নিন। এই দুই দফায় ভাজলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মচমচে হবেই।

বিকল্প ভরসা এয়ার ফ্রায়ার
এয়ার ফ্রায়ারের অনেকগুলো গুণ আছে। আর মচমচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পেতে হলে এয়ার ফ্রায়ার সবচেয়ে ভাল। অল্প তেলে প্রচুর ময়েশ্চার তুলে নিয়ে মচমচে করে দিবে। একবার হয়ে গেলে আপনার স্বাদমত সস বা সিজনিং ব্যবহার করুন।

সূত্র: ইত্তেফাক

রাসায়নিক উপাদান ছাড়াই ঘর মশামুক্ত রাখার উপায়

ডেঙ্গু সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। চারদিকে ডেঙ্গুর আতঙ্ক। সরকারও এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। শুধু মশার ওষুধ ছিটিয়ে আর লাভ হচ্ছে না। হচ্ছে না সমাধান অ্যারোসল বা মশার স্প্রে দিয়ে। আর রাসায়নিক পদ্ধতিতে মশা তাড়ানো স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর।

কদিন আগেই পেস্ট কন্ট্রোলের ব্যবহারে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর অনেকের মনে রাসায়নিক নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে প্রাকৃতিক উপায়েও মশা ঘর থেকে তাড়ানো যায়।

ঘরে পানি তো অবশ্যই জমতে দেওয়া যাবে না। তবে মশা তাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। ঘরে যদি শিশু থাকে তাহলে তো প্রাকৃতিক পদ্ধতিই আপনার অনুসরণ করতে হবে। আসুন এই পদ্ধতিগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক:

মশা প্রতিরোধকারী ফ্যান ও আলো ব্যবহার
ঠিক প্রাকৃতিক হয়তো একে বলা যায় না। তবে রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার না থাকায় এবং আলো ও বাতাসের মাধ্যমে যদি মশা দূর করা যায় তাহলে তা প্রাকৃতিক বলতে বাঁধা কোথায়। মশা তাড়ানোর বিশেষায়িত এক্সস্ট ফ্যান আছে। এই ফ্যান মশাকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেয় না। মশা যেভাবে উড়ে সেই ওড়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আর ঘরের যেখানে মশার জমাট বাধার সম্ভাবনা থাকে সেখানে হলুদ আলোর বাতি জ্বালিয়ে দিন। এই হলুদ আলো মশা তাড়াতে সাহায্য করে।

জানালায় পর্দা টানান
অনেকে বাড়িতে মশার নেট টানান। তারপরও ঘরের ভেতর জানালার সঙ্গে পর্দা টানিয়ে দিন। দরজাতেও তা করুন। এভাবে ঘরে মশার প্রবেশ করার সুযোগ অনেক কমে যাবে। বিশেষত দরজায় পর্দা লাগালে ও কোনো ফাঁক না রাখলে তো আরও ভাল।

সন্ধ্যা ও ভোরে জানালা বন্ধ
এই দুই সময় মশার একটা উৎপাত বাড়ে। তাই এই সময় জানালা বন্ধ করে

দেবেন। যদিও এ সময় ঘরে গুমোট একটা পরিবেশ তৈরি হয়। তখন সিলিং ফ্যান ছেড়ে দেবেন।

মশা প্রতিরোধী গাছের কথা জানেন?
ইনডোর প্লান্টের শখ থাকলে ত ভাল। ডেকোরেশনের পাশাপাশি যদি মশা তাড়ানোর সুব্যবস্থা থাকে তাহলে তো ঝামেলাই নেই। সিট্রোনেলা ও ল্যাভেন্ডারের কথা। এ ছাড়াও আছে বেসিল, পুদিনা, রোজমেরি ও গাঁদার মতো গাছ প্রাকৃতিক সুগন্ধি ছড়ায় যা মশার কাছে অন্তত প্রীতিকর নয়। এমন গাছ ঘরে বা বারান্দার টবে লাগালে মন্দ হয় না।

মোমবাতিও আছে
সিট্রোনেলা মোমবাতি আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। এর শক্তিশালী ঘ্রাণ মশাকে আকৃষ্ট করা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ল্যাকটিক অ্যাসিডকে ঢেকে দেয়। বাড়ির আঙিনায় কৌশলে মোমবাতি রেখে বা ডিফিউজারে সিট্রোনেলা তেল ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মশা তাড়ানো যেতে পারে।

সূত্র: ইত্তেফাক

চোখ সুরক্ষায় সানগ্লাসের ভূমিকা

আমরা অনেকেই ভাবি সানগ্লাস শুধুই ফ্যাশনের জন্য। বিষয়টা কিন্তু তা নয়। আসলে কথা হচ্ছে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচাতে সানগ্লাসের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। এবার কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

অতি বেগুনি রশ্মি

আকাশ মেঘলার চেয়ে রোদ ঝলমলে থাকাটাই অনেক পছন্দ করেন। কিন্তু অতিরিক্ত রোদে যে ক্ষতিকারক দিক রয়েছে, তা অনেকেরই জানা নেই।সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি চোখের জন্য খুবই ক্ষতিকর তাই চোখকে বাঁচাতে সানগ্লাসের পড়া অতি প্রয়োজন।

সানগ্লাস কিনতে বিশেষজ্ঞের সাহায্য

সুন্দর চেহারা বা রং দেখে সানগ্লাস কেনা উচিত নয়। কারণ সঠিক মাপ না হলে সূর্যের তাপ সরাসরি ঢুকতে পারে, যার ফলে যে লক্ষ্য নিয়ে সানগ্লাস পরা হয় সে কাজই আর হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ সানগ্লাস পরেও পুরো উপকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

সঠিত রং বেছে নেওয়া

সানগ্লাস কী আপনি প্রতিদিন ব্যবহার করেন, নাকি মাঝে মাঝে অথবা শুধু সমুদ্র সৈকত বেড়ানোর সময়? সূর্যের তাপ, সময়, জায়গা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে সানগ্লাসের রং। পরিবেশ আর পরিস্থিতির ওপরই নির্ভর করে সানগ্লাসের রং কী হবে, অর্থাৎ হালকা, গাঢ়, ব্রাউন, কালো না অন্য কোনো রং।

চোখের সমস্যা থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

চোখে ব্যথা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তা না হলে উপকারের চেয়ে অপকারই হতে পারে, বিশেষ করে কম দামি বা প্লাস্টিক জাতীয় সানগ্লাস ব্যবহার করলে। তাছাড়া সূর্যের তাপমাত্রাও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয়ে থাকে, তখন আরও বেশি সমস্যা হতে পারে।

সূত্র: ইত্তেফাক

অকালে চুল পাকলে খাদ্যাভ্যাসে আনুন বদল

চুল পাকার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। এমনকি, স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেও চুল পেকে যাওয়ার প্রবণতায় অবাক হতে হয়। অকালবার্ধক্য বা অকালপক্বতার কারণ হিসেবে উঠে আসে বহু পরিস্থিতি। বংশগতি, জিনগত সমস্যা, স্ট্রেস, ডায়েটসহ একাধিক পরিস্থিতি উঠে আসে।

অকালে অনেকেরই চুল পাকে। এমনটি অস্বাভাবিক তা বলা যাবে না। কারণ

বিভিন্ন কারণে চুলে অকালপক্বতা দেখা দেয়। তবে এই অকালে চুল পাকা বন্ধ করা সম্ভব। সেজন্য খাদ্যাভ্যাসে কিছু বদল আনতে পারলে ভালো। এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি ও বাহ্যিক পরিবর্তনেও প্রভাব রাখতে পারে। আসুন জেনে নেই খাদ্যাভ্যাসে কি কি বদল আনা জরুরি।

ফোলিক অ্যাসিড
ফোলিক অ্যাসিড থেকে ভিটামিন বি-৯ পাওয়া যায়। এটা ফোলেটের প্রাকৃতিক সম্ভার। ফোলিক অ্যাসিড ও ফোলেট ধরে রাখে মেলানিন। তাই বেশি করে খেতে হবে ঘন সবুজ শাকসবজি। পালংশাক, মেথিশাক, মটরশুটি খান। ডায়েটে রাখুন বিনস, ডাল, সূর্যমুখী ও কুমড়ো বীজ, কমলালেবু, আঙুর এবং লেবু।

ভিটামিন বি ১২
ভিটামিন বি-১২-র জন্য খেতে হবে ডিমের কুসুম, ডেয়ারি প্রডাক্ট এবং মাশরুম।

শস্য দানা
চুল কালো রাখার জন্য শরীরে মেলানিনের যোগান বজায় রাখা প্রযোজনীয়। মেলানিনের জন্য নিয়মিত খেতে হবে তিল, কাজুবাদাম, আমন্ড, গোটা দানাশস্য। কারণ এই খাবারে কপার বা তামা থাকে।

মাছ ও মাংস
কপারের জন্য খেতে হবে মাংস ও মিষ্টি পানির মাছ। মেলানিন ধরে রাখতে দরকার জিঙ্ক। চুলের ফলিকলে ক্ষতি রুখে দেয় এই উপাদান। নতুন কোষ জন্মাতে সাহায্য করে।

কুমড়ার বীজ
কুমড়োর বীজ, সূর্যমুখীর বীজ, তরমুজের বীজ, কালো তিল খেতে হবে জিঙ্কের জন্য। এছাড়াও পেস্তা, কালো চানাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খান শরীরে জিঙ্কের যোগান বজায় রাখতে।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]: [redacted]

বর্ষায় বাড়ে হেপাটাইটিস-এ এর শঙ্কা

হেপাটাইটিস বি নিয়ে সবার মনে যত আতঙ্ক হেপাটাইটিস এ নিয়ে অতটা নয়। তবে বর্ষার সময় হেপাটাইটিস-এ এর মতো রোগের শঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

হেপাটাইটিস-এ আসলে কি?

হেপাটাইটিস-এ একটি ছোঁয়াচে রোগ। তবে এই রোগ হেপাটাইটিস-বি এর মতো দীর্ঘমেয়াদী কোনো সমস্যা তৈরি করে না। এক সপ্তাহ কিংবা মাস-খানেকের মধ্যে রোগ নিরাময় হয় ও রোগীর সুস্থতা দ্রুতই হয়।

ডেঙ্গুর যেসব উপসর্গ দেখলেই হাসপাতালে যাবেনডেঙ্গুর যেসব উপসর্গ দেখলেই হাসপাতালে যাবেন
কাদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি?
এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন নেওয়া না থাকলে আর আগে যদি কখনো আক্রান্ত না হয়ে থাকেন তাহলে হেপাটাইটিস-এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আজকাল এমন ভ্যাকসিনও আছে যা একইসঙ্গে হেপাটাইটিস-এ ও হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধে সাহায্য করে। মূলত দূষিত পানির মাধ্যমে আমাদের ইমিউনিটি ক্ষতিগ্রস্ত করে এই ভাইরাস। বর্ষায় রাস্তায় বৃষ্টিতে ময়লা পানির সংস্পর্শে আসলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

হেপাটাইটিস-এ রোগের লক্ষণ

হেপাটাইটিস-এ রোগের লক্ষণগুলো সাধারণ। মৌসুমি জ্বরের সঙ্গে অনেকে তুলনা করে ফেলেন। হেপাটাইটিস-এ রোগের লক্ষণগুলো হলো:

. জ্বর আসার পাশাপাশি বমি হওয়া।
. পেটে তীব্র ব্যথা।
. চুলকানি বাড়া ও ক্লান্তি ভর করে।
. জন্ডিস হতে পারে তবে রোগের শেষ পর্যায়ে। আর জন্ডিস হলেই
চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
. চুলকানির সঙ্গে সঙ্গে প্রদাহজনিত সমস্যাও বাড়ে।
. অধিকাংশ রোগী নিজে নিজেই সুস্থ হয়ে যান। তবে জন্ডিস হলে
লিভারের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই গাফিলতি করা যায় না।

হেপাটাইটিস-এ সন্দেহে করণীয়

সন্দেহ হচ্ছে আপনার হেপাটাইটিস-এ? তাহলে এই পরামর্শগুলো মেনে চলুন:

. হেপাটাইটিস এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই তবে আপনি একটু আরামের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যাবেন।
. এই সময় স্বাস্থ্য সতর্কতা মেনে চলতে হবে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। এক সপ্তাহ বা মাসেই সুস্থ হবেন।
. নিজে নিজে জ্বরের বা চুলকানির ওষুধ খাবেন না।
. ধূমপান বা মদ্যপান এসময় ত্যাগ করতে হবে।
. প্রচুর পানি পান করুন।
. নিয়মিত হাত ধোবেন, বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে হাত-পা ধোবেন। সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

বৃষ্টির পানিতে চুলের যত ক্ষতি

বৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভিজুন কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে, চুলের ক্ষতি হবেই। মুষলধার কিংবা ইলশেগুঁড়ি যেভাবেই হোক, বৃষ্টি আপনার চুলের ক্ষতি করে। বৃষ্টিতে ভিজে ঘরে ফেরার পর লক্ষ্য করবেন চুল নিষ্প্রাণ হয়ে আছে।

বৃষ্টির পানিতে সালফার, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ও কার্বন থাকে। যাদের খুশকি আছে তাদের এক্ষেত্রে নানা অসুবিধা হতে পারে। তাই বৃষ্টিতে ভেজা চুলের আলাদা যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। রইলো কিছু পরামর্শ:

. ভেজা চুল বেশিক্ষণ রাখবেন না। বৃষ্টির পানিতে রাসায়নিক উপাদান থাকে প্রচুর। তাই বাড়ি ফিরে শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার করুন চুলে। . বৃষ্টিভেজা চুলে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করবেন না।
. ভেজা চুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে রাখুন। তোয়ালেই পানি আস্তে আস্তে শুষে নেবে।

. সবসময় মৃদু শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। নাহলে চুল

আর্দ্রতা হারিয়ে শুষ্ক হয়ে পড়বে।
. মোটা দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবেন।
. বর্ষায় দীর্ঘক্ষণ চুল বেঁধে রাখা স্বাস্থ্যকর নয়।
. সারারাত তেল লাগিয়ে পরেরদিন সকালে শ্যাম্পু করলে উপকার মিলবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

বর্ষায় ঘি খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন

বর্ষায় রোগের সংক্রমণ খুবই ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়৷ এ সময় খাদ্যতালিকায় ঘি যুক্ত করতে পারলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। ঘিয়ের দাম বেশি। তারপরও ঘি খাওয়ার অভ্যাস গড়লে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু ঘি কেন খাবেন? একবার ভেবে দেখুন।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর
ভালো মানের ঘিতে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে৷ সেই সাথে বর্ষাকালে সর্দি-কাশি ও ফ্লু প্রতিরোধ করে। ঘিয়ে ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এর পাশাপাশি ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ার কারণগুলো না বোঝার কারণ নেই।

বিপাকক্রিয়া বাড়ে
বিপাকক্রিয়া বাড়লে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অনিয়মের কারণে বিপাকক্রিয়ায় সমস্যা হয়৷ ঘি শরীরে শক্তি বাড়ায়৷ ফলে বিপাকও হয় ভালো।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়
মস্তিষ্ক সবসময় ফ্যাট বার্ন করে। আর মস্তিষ্কের জন্য ঘি সবচেয়ে আদর্শ স্নেহজাতীয় খাদ্য। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে বাদাম যেমন কার্যকর ঘিও তেমনি কার্যকর।

ভিটামিনে সমৃদ্ধ
ভিটামিন এ, ডি, ই, কে বাদেও কিছু ভালো উপাদান রয়েছে ঘিতে। তবে

ভালো মানের ঘি কিনতে হবে। দৃষ্টিশক্তির জন্য ভিটামিন এ যেমন জরুরি তেমনি হাড়ের গড়নের ক্ষেত্রেও ভিটামিন ডি জরুরি।

অন্ত্রে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন করে
ঘি অন্ত্রে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন করে। ফলে হজমও ভালো হয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

সঠিক সিরামে ত্বকের যত্ন

বয়স ৩০ পার হলেই ত্বকের লাবণ্য কমতে শুরু করে। ত্বকে নানা পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এক্ষেত্রে সিরাম ব্যবহার করাই শ্রেয়। কিন্তু ত্বকের জন্য কেমন সিরাম ব্যবহার করবেন? সে বিষয়ে রইলো কিছু পরামর্শ:

শুষ্ক ত্বকের জন্য
ত্বক যদি হয় শুষ্ক তাহলে ভিটামিন ই সিরাম ব্যবহার করুন। গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও হাইড্রোলিক অ্যাসিডও থাকতে হবে। এগুলো ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করবে।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য
ত্বক তৈলাক্ত হলে অনেক ভেবেচিন্তে সিরাম বাছাই করতে হয়৷ ত্বকে অনেক বেশি সিরাম তৈলাক্ততা আরও বাড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে জেল বেজড সিরাম নেয়াই ভালো।

সাধারণ ও মিশ্র ত্বকের জন্য
এই ধরনের ত্বকের জন্য ভিটামিন সি ও রেটিনল সমৃদ্ধ সিরাম নেওয়া জরুরি।

ব্রণর সমস্যা বাড়তি হলে
স্যালিসিলিক অ্যাসিড ও জিঙ্কসমৃদ্ধ সিরাম ব্রণের সমস্যা বাড়তে দিবে না।

সজীব ত্বকের জন্য

ত্বকের সজীবতা ফিরে পেতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও গ্রিন টি এর নির্যাসসমৃদ্ধ সিরাম ব্যবহার করুন।

সূত্র: ইত্তেফাক